দিলীপ ফৌজদারের প্রবন্ধ

বসতি

ভূমির মতো মৌলিক এক সম্পদের দিকে তাকালে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে আসে যে একদিকে বেড়ে ওঠা জনসংখ্যা ও অপরদিকে প্রকৃতিগত ব্যবস্থাগুলির স্থাবর সীমাবদ্ধতা মানুষকে এক অপরিভাষিত সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই সংকটই ব্যক্তিগত স্তরে মানুষকে এক সঙ্কীর্ণ অবস্থার ভেতরেই হাত পা মেলতে শেখাচ্ছে। প্রকৃতি থেকে মানুষ দূরে সরে যেতে বাধ্য হলেও সে প্রকৃতিকে আঁকড়াচ্ছে যাপনের আলো, বাতাস, জল, খাদ্য ইত্যাদির চাহিদা মেটাতে। জমির ওপর জমি ফুরিয়ে গেলে বসতবাড়ির ছাদকে জমি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সে বসতের জন্যই হোক বা বাগান করার জন্য কিংবা গাড়ি রাখার জন্য। এর থেকেই বহুতল বাড়ির পরিকল্পনা। বসতি যেভাবেই গড়ে উঠুক, তার ওপর আস্থা গড়ে না উঠলে তা বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না।

এ থেকে আর একটা কথাও মনে এসে যায় যে প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই দুটো শব্দকে যতদিন মানুষ সমার্থক মেনে প্রকৃতি পূজা করে এসেছিল ঈশ্বর জ্ঞানে, যতদিন আস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন মানুষ প্রকৃতির সম্পদ থেকে অফুরন্ত আহরণ করে গেছে। ফলন্ত জমি থেকে তুলেছে খাদ্যের ফসল, নিবিড় জঙ্গল থেকে তুলে এনেছে জ্বালানি ও নির্মাণের কাঠ; তার সঙ্গে ফল, মধু, জড়িবুটি। ধরে রেখেছে বৃষ্টির জল সারা বছরের জন্য। ঝরনা ও নদীদের স্রোতের সঙ্গে যাপনের সম্পর্ক জুড়েছে যাতে পানীয় জল, অন্যান্য প্রয়োজনের জল বা অনাবৃষ্টির দুর্দিনের বিশেষ টানাটানির সময়কার ফসলের চাহিদা মেটানোর জল এসবে কখনো টান না পড়ে। এইসব বিবিধতা নিয়েই মানুষের দৈনন্দিনতার জীবনস্রোত সে কতকালের কেউ জানে না। কিন্তু চলে এসেছে, এতটা জানে। এই চলে আসার ভেতরে ভেতরে আছে প্রকৃতির রোষের কথাগুলিও, মানুষ যার বলিও হয়েছে যেমন তেমনি তা থেকে শিখেছে বাঁচার, সতর্কতার, এড়ানোর ও জিতে নেওয়ার জটিলতর পন্থাগুলি। এমনিতর আরো বিবিধ জটিল পদ্ধতি মানুষ আয়ত্ত্ব করেছে যেগুলি স্থানিক বা স্থানবিশেষে কিছু রদবদল করে নেওয়া ভূমিজ ধর্মে, আস্থায় ও বিশ্বাসে। এগুলি অনেক বছরের সাধনায় রপ্ত করা। এর পেছনে দেওয়া আছে অনেক ভুলের মাশুল। পরিবর্তনের তোড়ে ভুলে যাওয়া জীবনযাত্রার কিছু

সূক্ষ্মতর মন্ত্র মানুষকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে সেই অধ্যবসায়ের প্রকরণ গুলিতে। Trial and error প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের একটি অভিন্ন ও জরুরি করণীয় ক্রিয়া। এগুলি না থাকলে কোনো নতুন ব্যবস্থা, প্রয়াস বা পরিকাঠামোকে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়।

প্রকৃতি এখন রাজনীতির হাতে। সেখানে নির্ণয় হয় প্রকৃতির কোন সম্পদকে কীভাবে দোহন করা হবে। স্বাধীনতার পরবর্তী ৫০ বছরেও বনের গাছ, ভূগর্ভের খনিজ সকলই ধরা হত দেশের সম্পত্তি হিসেবে ও এগুলির আহরণ বা খনন দেশচালনার, এবং অবশ্যই, দেশ গড়ারও অর্থ যোগাত। বন ঠিকাদারেরা ও খনি মালিকেরা তুমুল লালসার এলোপাথাড়ি কুঠার ও গাঁইতা চালিয়ে প্রকৃতিকে আলাদিনের খাজানার জ্ঞানে খালি করে গেছেন বছরের পর বছর। এর পেছনে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ বা নজরদারির জায়গা ছিল না বা থাকলেও তা ছিল নামমাত্র। আস্তে আস্তে এই অতিক্রমণের কুফলগুলি প্রকট হয়ে উঠল যার নানান লক্ষণ দেখা দিল খালি হয়ে আসা বন, স্তূপাকার খননের বর্জ্য ও ইতস্তত ফুটে ওঠা খননের গহ্বরগুলি কখনো পাহাড়ের গায়ে বা পরিত্যক্ত প্রান্তরগুলির মাঝামাঝি কদাকার ঘা হয়ে। খনিজ তুলে নেওয়ার পর রিক্ত গহ্বরগুলি পুনরায় ভরে ওঠার কোনো ব্যবস্থা প্রকৃতির হাতে থাকে না এই অসম্ভাব্যতার কথা যথেষ্টভাবে জানার বিষয় হলেও এই বিষয়ে দেশের খননননীতিতে রক্ষণশীলতা দেখা গেছে অল্পই। ঠিক এরই সঙ্গে জোড়া খনন পর্ব সমাপন হওয়ার পরবর্তী সময়কার ছেড়ে যাওয়া গ্রাম বা বসতিগুলির কথা। সেখানেও আর ফসলের জমি নেই সেগুলি অধিকার করে রেখেছে খননের বর্জ্য। মানুষের হাতে রোজগার নেই খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। খনির সঙ্গে জোড়া ব্যবসার স্রোতগুলি শুকিয়ে গেছে আপনাআপনিই। এই নৈরাশ্যময় অবস্থা চলতেই থাকে। কাজে কাজেই, খননের পরবর্তী সময়ে, পরিবেশ ও সমাজ দু জায়গাতেই রিক্ততার বিষয়টি প্রকট হয়ে থাকে। এই কথাটির সঙ্গে এ কথাটিও জোড়া থাকে যে দেশে কোনো গঠনমূলক বা লাভবান কাজের আরম্ভকালের উৎসাহ-উদ্দীপনা যতখানি ধরা থাকে নীতিগঠনে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিতে বা প্রযুক্তি পরিকল্পনায়, প্রজেক্টটি সমাপন করার বিষয়টির সেখানে কোনো উত্থাপন বা উল্লেখ থাকে না।

জল, ফসল ও বনজ পণ্য এদের বছর বছর তুলে নিলেও এগুলি আবার করে গজায়— কোনোটি বৎসরান্তে কোনোটি বা ৪০-৫০ বছরে। সেখানে লোহা, ম্যাঙ্গানীজ বা সকল রকমের ধাতু একবার খনি থেকে উঠে এলে আর সেখানে নতুন করে জন্মায় না। ধাতুগুলিতে অল্প যে পরিমাণ ক্ষয় হয় তা ফিরে না এলেও তার অধিকাংশটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা যায়। কয়লা পেট্রোলিয়ম ও

প্রাকৃতিক গ্যাস, এগুলির ব্যবহার হয় জ্বালানি হিসেবে; এগুলিকে কাজে লাগানোর পর এদের পুনরায় ফিরে পাওয়ার বা ঘুরিয়ে ব্যবহার করার কোনো সম্ভাবনা আর থাকে না। প্রকৃতির খনিজ ভাণ্ডারের সব আকর শেষ হয়ে গেলেও গাছপালা জল ও মাটির একটা চক্রাকার পুনর্জন্ম আছে প্রকৃতির প্রণালীতেই। যে কারণে পেরিয়ে যাওয়া সময়ের ওপরে নতুন যাপনের পুনর্রচনার কল্পনা একটি অবশ্যম্ভাবী অবস্থা। অবশ্যই, এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হয় যে মানব যাপন এখন এমন অবস্থায় এসে গেছে; মানুষের অভ্যাসরীতিতে খনিজ ইন্ধন ও ধাতুর ওপর নির্ভরতা এমন এক স্তরে পৌঁছে গেছে যে রাতারাতি একটা প্রকৃতিচক্রের সঙ্গে মানুষ নিজেকে জুড়ে নিতে পারবে না যাতে এগুলি নেই।

কিন্তু খনিজ আকর বা প্রকৃতির অন্যান্য সম্পদগুলি দেশের বা দেশের ক্ষমতা রাজনীতি বা নিহিত শাসনক্ষমতার সম্পত্তি নয়। তাদের ততখানিই ব্যবহার করা যায় যাতে তাদের স্রোত মানুষের খাঁই এর হাতে আহত না হয়। এখানেই প্রকৃতির ভান্ডারে মানুষের অনুপ্রবেশে একটা বাধার হাত এসে যায়। প্রকৃতির যে কোনো সম্পদে দোহনের আগে ভাণ্ডারটির সঠিক ক্ষমতা জেনে নেওয়ার একটা হক প্রশ্ন আসে। এখানে অনেকে বলতেই পারেন যে আন্দাজে ভর করে খনন আরম্ভ হয় না, অনেক গবেষণার পর কোন জায়গায় কীসের খনন যথার্থ হবে এ নিয়ে সরকারের অনেক তেল পোড়ে। এই পরিস্থিতি অতখানি সরল নয় যে সওয়াল জবাবে এর খোলাসা পাওয়া যেতে পারে, অবস্থাটি একটু জটিল প্রকৃতির, বুঝতে গেলে সম্পর্কিত অনেক কিছু ব্যাপার জানতে হয়। যখন কয়লা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল সে সময় অনেক নিচুমানের কয়লা মাটির তলা থেকে তোলা হয় নি, শুধুমাত্র উঁচু মানের কয়লাটুকু তুলে লাভের শতাংশ বাড়িয়ে ব্যবসায়ীরা মুনাফা কামিয়েছেন। যে সম্পদটুকু মাটির তলায় থেকে গেল তা তুলতে যে খরচ পড়বে তার অনেক অল্প প্রয়াসে পুরো কয়লাকেই তুলে আনা যেত, দেশের রাজস্ব বাড়ত। এটা শুধু কয়লার কথাই নয়। খনিজ সম্পদের অনেকটাই এইভাবে অপচয় ও তুলে নেওয়ার ফলে তলানিতে পৌঁছে গেছে। সবরকমের খনিজ নিষ্কাশনেই দেখা যেতে পারে এই ধরনের অপচয় ও প্রকৃতির ওপরে অনেক আনুষঙ্গিক ঔদ্ধত্য। এখন এসব অবস্থায় অনেক সংশোধন আসা সত্ত্বেও অনেক উপদ্রব আজও ঘটে যাচ্ছে প্রকৃতির ওপর।

প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের মঙ্গলের জন্যই ব্যবহার করা হয়। তবুও এ ব্যাপারে দেশের রাজনীতি প্রকৃতিকে দোহন করায় একটু বা বেশি রকমের রূঢ়। এই রূঢ়তায় দেশের অর্থনীতি নির্ণায়কদের একটা বড়ো হাত আছে। এই নীতিগুলির ভেতরে নিহিত আছে দেশকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জগতের ধনী

দেশগুলির মডেলে গড়ে তোলার অভিলাষ। সেগুলি টিকবে কি না বা কি ভাবে সেগুলি টেকানো সম্ভব হবে এদিকটায় নজর তেমন নেই এ কথাটি স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে নীতিনির্ধারণের পরবর্তী সময়ের এই নীতিগুলির রূপায়ণের আচরণগুলিতে। এখানে চোখে পড়তে পারে দেশের নীতিনির্ধারণ বা তার রূপায়ণ প্রক্রিয়ার জায়গাটির মৌলিক দুর্বলতার চেহারাটি। প্রকৃতি সম্পর্কিত অনেক তর্ককে এখানে এড়ানো হয় অথবা ক্ষমতা ও সাময়িক চাহিদাগুলির চাপ থাকার কারণে সেগুলিকে আসতে দেওয়া হয় না। সামাজিক স্তরেও এই অবস্থাটির বিশেষ প্রতিফলন হয়। কোনো আলোড়নহীন গ্রামাঞ্চলে বা বনাঞ্চলে খনি কিম্বা কারখানা খুললে অল্প যে কটি পরিবার তা থেকে উপকৃত হয় পরিবারের সদস্য সেখানে কাজ পাওয়ায় বা জমি অধিগ্রহণের মোটা টাকা হাতে আসায়, বাকি পরিবারগুলির এতে কোনো সুবিধা না আসায় তাদের দারিদ্র্য ঘোচে না বা সাধারণভাবে যাপনের স্রোতটি তাদের কাছে বদলে যায় ও সামাজিক একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়। একা সামাজিক অবস্থা নয়, আর্থিক অবস্থাতেও অনেকখানি হেরফের ঘটে। এই ব্যাপারটি বাঁধ প্রকল্পগুলিতেও ব্যাপকভাবে আসে। কেউ সেচের সুবিধা পায়, কেউ পায় না এতে পারিবারিক স্তরে একটা ব্যবধান ঘটে যায়। এরই পাশাপাশি সংলগ্ন দুটি অনুরূপ গ্রামের আর্থিক অবস্থায় হেরফের ঘটে যায়। দুটি গ্রামের পরিবর্তিত আর্থিক অবস্থার পার্থক্যটি চোখে ধরা পড়ে।

খনিজ সম্পদ যখন যথার্থ গবেষণা ও মূল্যায়নের পর দেশের সম্পত্তি হয় তার পরেও সরকারী ব্যবস্থার অনেক দায়িত্ব থাকে— এই প্রণালীকে যথেষ্টভাবে সক্রিয় ও পেশাগতভাবে সুষ্ঠু করে তোলার জন্য বিভিন্ন পেশা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থাটি এদেশে মৌলিকভাবে সুস্থ নয়। এ সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে খনিজ সম্পত্তি বাজারে তোলার ব্যাপারে এবং সামগ্রিকভাবেও এই সম্পত্তির অর্থনীতিতে অনেকের যোগদান আছে। সেগুলি মূলত কিছু সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দিয়ে চালান হয়। এই কথাটি প্রাকৃতিক অন্য সম্পদগুলির বেলায় খাটে না।

প্রকৃতির এই অব্যবস্থিত সম্পদগুলির ভেতরে পড়ে জমি ও জল এবং এদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জোড়া জীবনযাপন। জমির প্রসঙ্গে পাহাড়ও আসে, ঘর বাড়ি নির্মাণের পাথর আসে পাহাড় কেটে। নদীর বালি তুলে নেওয়া হয়। যেসব জায়গায় নদীর বালি ঘর নির্মাণের উপযুক্ত নয় সেখানে জমির ভেতর ধরে রাখা বালি যা ভূ-জলের আধার, সেও তুলে নেওয়া হচ্ছে। দিল্লির মতো জায়গায় এসব হচ্ছে বেশ বড়ো হারেই। যমুনার বালি নির্মাণে ব্যবহার করা যায় না ও দিল্লিতে এবং এর লাগোয়া শহরগুলিতে নির্মাণ চলছে এক অতি বিশাল

মাত্রায়। এই চাহিদার খাঁই মেটানো হয় মাটির তলায় জমে থাকা বালি দিয়ে। দিল্লির এই বালির নাম বদরপুর। সম্ভবত বদরপুর গ্রাম থেকেই খনিজ এই বালি তোলা হত। এখন দিল্লি নগরীর আশেপাশে অসংখ্য বালি তোলার খনি যাদের অনেক কটিতেই আর বালি নেই। খনি সম্পর্কিত স্পষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও জমির তলাকার পাথর ও বালি তোলা হয়ে যাচ্ছে অত্যন্তই দায়িত্বহীন এবং বেআইনি ভাবে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর এ ধরনের লুঠতরাজ ও আইনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা অন্য কোনো দেশেও হয় বলে জানা নেই। দিল্লি একা নয়, ব্যাঙ্গালুরু, জয়পুর, মুম্বাই, চেন্নাই কেউ বাদ নেই। বুন্দেলখণ্ড-এর এক একটা পাহাড় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এই খাঁই মেটাতে।

দেশ যেহেতু গণতান্ত্রিক, ভোটব্যবস্থায় নির্ণয় হয় শাসকদের ভবিষ্যৎ। জল ও জমি সংক্রান্ত অনেক নীতিই রাজনীতির দলগুলি সৃজন করে বেশি ভোট পাওয়ার উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে। সে যাই হোক, জল ও জমি নিয়ে সরকারের উদ্ধত অধিকারবোধ ও পর্যবসিত ক্রিয়াকর্মগুলি এখন জমির ওপর দৃশ্যমান। এগুলি হল নগর নির্মাণ এর কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক অফিশিয়াল সাক্সেস স্টোরি। এগুলির দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে যে সেসব অঞ্চলের স্থানিক ও আগতদের ভেতরকার একটা বোঝাপড়া বা মেলমেলাপের কথাটি অনুক্ত রেখেই প্রকল্পটিতে দাঁড়ি টানা হয়ে গেছে। নগর নির্মাণেও স্থানিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা হয়। জমির স্বত্ব বদলের সঙ্গে স্থানিকেরা সহসাই এক নগরমুখি সভ্যতার মোকাবেলায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এই সংস্কৃতিগত, অর্থনীতিগত আচরণ বিশেষ করে টাকা খরচ ও কেনাকাটার আচরণগুলি ও আগ্রহের ভিন্নতার ভেতরে দুই বিবিধতাময় সম্প্রদায়ের একত্রবাস ও জলমাটির ভাগাভাগি সুখ ও স্বস্তিকে বাদ দিয়েই হয়। এর ফলে এসব জায়গায় স্থানীয় আচার আচরণের প্রয়োজনে কোনো কিছু জানান না দিয়েই রাস্তায় চলাফেরা ব্যাহত হয়, গাড়ির জ্যাম লাগে ও তা নিয়ে ঝামেলাও হয়। অফিস, স্কুল, দোকান বাজারের মতো দৈনন্দিন করণীয়গুলির রুটিনে গোলমাল হয়।

জীবনচর্যাকে মানুষ অনেক কালের অধ্যবসায়ে একটা সরল অবস্থায় আনতে পেরেছিল। সেই সরলতায় এখন আর ফেরা যাবে না। এটি একটি রূঢ় সত্য আজকের মানুষের কাছে। গ্রাম্যজীবনে প্রকৃতি, সমাজ ও অর্থব্যবস্থা নিয়ে যাপনে যে পরিমাণ বিবিধতা ও চয়ন-সম্ভাবনা মানুষের নাগালে ছিল এখনকার যাপনে তা আর নেই অথচ তারই ভেতরে নিহিত ছিল স্থায়ী, সন্তুলিত, সুষ্ঠু, যাপনের বীজ। গরিব নগরবাসী গরিব গ্রামবাসী থেকে অনেক বেশি গরিব। নগরবাসী গরিবের কাছে টিকে থাকার (survival এর) অত বিবিধ উপকরণ নেই যা এখনো

আছে গরিব গ্রামবাসীর। যে কারণে এই সময়কার যাপনে সেই নির্ভরতাও আর নেই। বর্তমান সময়ে নির্ভরতার মাত্রা ও চেহারা দুটোই বদলে গেছে। এখন খাদ্য ও জলের নির্ভরতা, আবাসের নির্ভরতা, ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুরক্ষা, যাতায়াতে সুরক্ষা সবকিছুতেই ভিন্নতা এসে গেছে সমস্যাগুলি বা উৎকণ্ঠাগুলি যদিও বা এক।

গ্রামকেন্দ্রিক যাপনে যেমন বিবিধতা ছিল তেমনি গ্রামের ছোটো পরিসরে ব্যবস্থাগুলিও ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ যেটা অনেকটাই চালিত হত গ্রামস্থ বাসিন্দাদের কাজ ভাগাভাগি নিয়ে যেটা ছিল পরিবারগত ও পরম্পরা ভিত্তিক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল গ্রামগুলিকে আঁকড়ে। কৃষিই ছিল যাপনের মূলে। এরই পরবর্তীকালে প্রায় কোনো আলোড়ন না তুলেই গ্রাম থেকে শহরে উঠে আসার এক পর্যায়ের শুরুয়াত হয়। এর পেছনকার তাগিদের মূলে ছিল শিক্ষাগ্রহণের ঈপ্সা ও তারই সঙ্গে একান্তভাবে জোড়া কর্মসংস্থানের বিষয়টি। এর পরবর্তীকালে আরেকটা হিড়িক এলো গ্রাম থেকে শহরে উঠে আসার। সে সময় একটা বড়ো হারে নতুন শিল্পনগরীগুলি গড়ে উঠছিল। এর শেষ পর্যায়ে ছিল আগ্রাসী নগরায়নে গ্রামগুলিকে আত্মসাৎ করে নেওয়ার একটা মন্থর অথচ আরও ব্যাপক এবং অবশ্যম্ভাবী প্রকরণ। ক্রমশ দেখা যাচ্ছে জীবনযাপনে একটা নাগরিক অভ্যাসের দিকে যাওয়ার উন্মুখতা, যদিও, এখনো দেশের অধিকাংশ মানুষ এ পর্যন্ত নগরজীবনের অভ্যাসগুলিতে পুরোপুরি আসতে পারেন নি। এ সময় দেশের ৩১.৮ শতাংশ (২০১১ আদমসুমারি, ভারত সরকার)-এরও বেশি অধিবাসী নগরে থাকেন এবং এই ধারাটি বর্ধিষ্ণু। নগরে বাস করার অভ্যাসগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ওপর নির্ভরতা উপদ্রবের পর্যায়েই পৌঁছে যায়। এটি বিশেষ এই কারণে হয় যে জল ও মাটি সম্পর্কিত আধিকারিক বা নীতিগত নির্ণয়গুলি অর্থনীতির চাহিদা ও যোগানের নিয়মগুলিকে যতখানি গুরুত্ব দেয় প্রকৃতির ভান্ডারে টান পড়ার ব্যাপারগুলিকে ততখানিই উপেক্ষার জায়গায় রাখে। গভীর সঙ্কটগুলির সময়ে ভুক্তভোগীরা দেখে কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অলীক ধারণাগুলি মানুষকে তার শতাব্দীর অভ্যাস ও বিশ্বাসগুলি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে এক অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই নৈরাশ্যের মূলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নেই, আছে একটা জেদি ও পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রত্যয়। প্রকৃতির ভান্ডারকে অতিরিক্ত নিংড়ালে তার প্রণালী ভেঙে যায়, অনেক সময় তা জোড়াও লাগে না। প্রযুক্তি অনেক অবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলিকে এড়িয়ে যায় প্রকল্পটিকে ত্বরান্বিত করতে বা ব্যক্তিগত আগ্রহগুলিকে রক্ষা করার তাগিদে কিন্তু এই অবস্থার সর্বোপরি দায়িত্বে

থাকেন রাজনেতারা। এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযোগ্য সমন্বয় না থাকার মূলে রয়েছে দেশের নীতিনির্ণায়কদের দায়বদ্ধতার অভাব। এ বিষয়টি নীতিনির্ণয়ের প্রাথমিকতাতেও আসে না। অথচ এই সমন্বয়ের অভাবেই প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি আহত হয়। আজকাল টিকে থাকার কথাটি বা sustainability এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার স্তরে বেশ আলোড়ন থাকলেও ব্যবহারের জায়গায় অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কেননা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বতল্লাশে সময়, খরচ, জনবল ও প্রকৃত জ্ঞান লাগে; অনেক ব্যাপারে সময় গড়ায় বেশ কিছু মাস। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিলম্বের আর একটা কারণ দেশে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার আয়োজনগুলি বা তার পরিকাঠামোগুলিও এদেশে যথাযথ এবং যথেষ্ট নয় অনেক অবস্থাতেই।

অনেকে প্রত্যয় নিয়ে বলেন জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে এ ধরনের অসন্তুলন অবশ্যম্ভাবী। অনেকে আবার বলেন প্রকৃতির ভেতরেই আছে এর সংশোধন। প্রকৃতির যে সংশোধন আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাই তার ভেতরে কিছু অঘটনের কথাও আছে। এই অঘটনগুলির নিরীহতম, যেগুলি অনবরতই ঘটে যাচ্ছে সেগুলির ভেতরে পড়ে বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক অবস্থায় পানীয় জলের অভাব, খাদ্যাভাব, খরা ও বন্যা ইত্যাদির কারণে বিস্থাপন ও তারই সঙ্গে জোড়া মানবিক স্তরের ভোগান্তি। প্রাকৃতিক সম্পদের বাঁটোয়ারা নিয়ে স্থানিক স্তরে ক্ষমতার লড়াই-এর কারণেও অনেক অঘটন ঘটে, লোকক্ষয় হয়। এই সব অঘটন এতই আলোড়নহীন যে এগুলি আসে ও প্রায় নিঃশব্দেই পেরিয়ে যায়। বড়ো আলোড়ন তোলা অঘটনগুলির ভেতরে পড়ে বড়ো মাপের আকস্মিক বিধ্বংসী বন্যা; মেঘ ফাটা বৃষ্টি (অল্পসময়ের ভেতরে এক বিশাল মাপের বৃষ্টিপাত), ঘূর্ণিঝড় ও সাইক্লোন, ভূমিকম্প ও সুনামী, ভূস্খলন জাতীয় প্রলয়গুলি। কখনো কখনো এই প্রলয়গুলির একাধিক চেহারা একসঙ্গে জুড়ে যায় যেমন সম্প্রতিকালে উত্তরাখণ্ড-এ ঘটে যাওয়া বিপর্যয় যা শুরু হল অল্পসময়ের ভেতরে এক বিশাল মাপের বৃষ্টিপাত দিয়ে যার ফলে হিমালয়ের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে ব্যাপক ভূস্খলন ও এরই অব্যবহিত পরবর্তীকালে অনেক নদীতে একই সঙ্গে নেমে আসা হড়পা বান। এখন নজরে পড়ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির সঙ্গে নৃ-কৃত উৎপাতগুলি জুড়লে এগুলি কীরকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। হিমালয়ের সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ভিড় করা গাড়িদের সারি পাহাড়ের গ্রহণক্ষমতাকে অতিক্রম করে গেছে। এক একটি তীর্থস্থলে আসা যাত্রীদের ভিড় তীর্থগুলির প্রত্যেকটির গ্রহণক্ষমতাকে অতিক্রম করে গেছে।

আর এটা শুধু তীর্থস্থানগুলির কথাই নয়, জীবনের প্রতিটি স্তরে বর্ধিষ্ণু

বিলাসবহুলতা প্রকৃতির ওপর উপদ্রবের মাত্রাটিতে এক অস্বস্তিকর ত্বরণ এনে দিয়েছে। একসময় মানুষ অনেক নিষ্ঠায়, বিশ্বাসের ক্ষমতায় পায়ে হেঁটে পাহাড়ে চড়তেন তীর্থদর্শনের অভিলাষে। এখন বদ্রীনাথ, কেদারনাথের মত মহিমাময় তীর্থস্থলেও পাঁচতারা হোটেলের আরাম দাবী করছেন যাত্রীরা। হেলিকপ্টারে যাওয়া আসার ব্যবস্থা হয়েছে। ট্যুওরিজমের বাজার খুলে গেছে। এই দুর্গম তীর্থগুলি এখন জনসাধারণের নাগালে। চাহিদা এতই বেশি যে পাহাড়ের গ্রহণক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে একের পর এক ইঁট পাথর সিমেন্টের আস্থাবান দালান উঠছে এই সব মৌলিকভাবে অনাস্থাবান জমিকে আঁকড়ে। মাত্র এই কদিন আগেই সংবাদ টিভিতে দেখলাম কা নির্বিকার নিষ্ঠুরতায় এ ধরনের দালানবাড়িগুলিকে ধ্বসে যেতে, ভাগীরথীর, মন্দাকিনীর, অলকানন্দার রোষে।

এর বিপরীতে রয়েছে এই বেড়ে ওঠা জনসংখ্যাকে নিয়েও প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একটা সহাবস্থান প্রয়াসের কল্পনা। এই প্রয়াসে উদ্‌বর্তনের বা survival এর প্রশ্নটি জোড়া আছে সেটি স্পষ্ট ভাষায় বলে না দিলেও। এ ধরনের সহাবস্থানের পশ্চাৎপটে আমরা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেতে পারি ক্রমশ বেড়ে ওঠা জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা বদলে যাওয়া জীবনচর্যাও। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকার অভ্যাস হয়ে গেলে চাষজমিতে বড়ো জায়গা ঘিরে ঘরতোলার ক্রমবর্ধমান ধারাটি কমে আসার একটা সম্ভাবনা জাগে। এতে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদনের জমিতে টান পড়ে না। সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত আচরণে আনা পরিবর্তনগুলিকেও, বদলাও-এর প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রকৃতির মূল দুটো উপকরণ, জমি ও জলের কথা প্রতিটি স্তরে মনে রাখতে হয়।

সহজ সরল মানুষদের বসতি গড়ে এমন এক উপযুক্ত জায়গায় যেখানে জমি ও জলের ভাবনা ভাবতে হয় না, তার ওপরে গড়ে ওঠে সেই জমিতে খাদ্য উৎপাদনের উপায় ও পদ্ধতিগুলি। ইন্ধন ও ঊর্জার জোগাড়। আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া— তার উপযুক্ত করে শারীরিক প্রয়োজনগুলিকে যোগানো। খাদ্য, পোশাক-আসাক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণ— এগুলি স্থানবিশেষে, আবহাওয়ার অবস্থাবিশেষে ভিন্নতা পায়। পায়ের তলায় মাটি পেলেই মানুষ ভাবে খাবে কী! পানের জল কোথা থেকে আসবে! এই দুটি মূল উপাদান আয়ত্তে এলেই মানুষ টিকে যায় যে কোনো অবস্থায়। যাপনের সূক্ষ্ম আচরণগুলি গড়ে ওঠে ভৌগোলিক সুবিধা অসুবিধাগুলিকে মেনেই। যে কারণে আমরা দেখতে পাই অতি দুর্গম জায়গাতেও, অতি দুর্ধর্ষ, সম্পূর্ণভাবে অপ্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও মানুষের বসতি গড়ার প্রয়াস। লেহর মতো হিম মরুঅঞ্চলের দুস্ত পাহাড়ীর ভেতরে, হিমালয়ের হিমবাহগুলির কাছাকাছি দুর্ধর্ষ আবহাওয়ায়, কোলকাতার ও সুন্দরবনের

দুর্গম জলাজমিগুলিকে আঁকড়ে সবরকমের নাগরিক সুবিধাগুলির থেকে বঞ্চিত হয়েও বসতি গড়ার লড়াকু প্রয়াস। যেমন ভূমির ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে কোনো জমিই ফ্যালনা নয় তেমনি যে কোনো জায়গাই মানুষের বাসের উপযুক্ত হয়ে যায়। আসলে মানুষই আপন ইচ্ছা, সংকল্প ও চেতনা দিয়ে জায়গাটির প্রকৃতিকে চিনে নেয় এবং সেই সঙ্গে এটাও নির্ণয় করে ফেলে যে কীভাবে জীবনধারণের প্রক্রিয়াগুলিকে দাঁড় করানো হবে ওরকমের একটা পরিস্থিতিতে। এটা তৈরি হতে অনেক বছর লেগে যেতে পারে কিন্তু বেছে নেওয়ার অনেক ভিন্নধর্মী প্রয়াস এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলে।

জীবনধারণের এই সমস্ত রকমের প্রক্রিয়াতেই প্রকৃতির অবদান থাকে ও প্রকৃতির পরিস্থিতিতে ভিন্নতার জন্য বিভিন্ন অবস্থার যাপনে মানুষের আবাস, খাদ্য, পোশাক, আচরণ ইত্যাদির বিবিধতা। এক একটি দেশ, অঞ্চল, রাজ্য সে যত বৃহৎ বা যত ক্ষুদ্রই হোক, তার ভেতরেও গড়ে ওঠে এই বিবিধতা এবং এর ওপরেই আরোপিত হয় আরও নানান ধরনের জটিলতা। একটা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ইতিহাসকেন্দ্রিক পরম্পরার সৃষ্টি হয় এক এক গোষ্ঠীতে যাকে আঁকড়ে গোষ্ঠীবদ্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা। এর অনেক প্রকরণে সংস্কারের অনেক গহনেও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দেখতে পাওয়া যায়। চাষবাস হলে ভাবতে হয় কীসের চাষ বা কোন সময়ের। এছাড়াও আছে পশুপালন, কীটপালন, মৎস্য, ফল ও ফুলের চাষ, মশলার বাগিচা বা বনসৃজন। এগুলি অনেক সময় মিলিত ভাবেও হয়। বাজারে সঙ্গেও বসতি জুড়ে যায়। স্থানবিশেষে ভূমি ও আবহাওয়ায় উৎপন্ন ফসল দিয়ে খাদ্য-আচরণগুলি গড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে এই খাদ্য উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করা হয় অন্য উৎপাদনগুলির বিনিময়ে। এক সমাজ বা সম্প্রদায় প্রতিবেশী সমাজগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে। এগুলি জীবনযাপনের অঙ্গ হতে যেমন অনেক বছর লেগে যায় তেমনি এগুলি বদলাতে গেলেও লেগে যেতে পারে অনেক অনেক বছর।

যে সংস্কার বা পরম্পরা গড়ে শতাব্দীর আস্থায়, সে সংস্কারকে বিসর্জন দেওয়ার কথা মানুষ ভাবে না কিন্তু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অবস্থায় দ্রুত বদলাতে থাকা ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে, সামাজিক অবস্থায় ক্রমাগত বিবর্তন হতে থাকায় মানুষকে মাটি আঁকড়ানোর এক নতুন লড়াই প্রতিনিয়ত লড়তে হয়। এইভাবে মানুষের বসতি এক অসাধারণ ত্বরায় বদলে যাচ্ছে। এর ভেতরেই আছে এই সময়কার পরম্পরা ও তথাকথিত আধুনিক মনস্কতার যাপন পদ্ধতিগুলির মেনে নেওয়া এবং অ-বনিবনার সঙ্কট। এই বোঝাপড়া ও অ-বনিবনার অনেক কটিই প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কাজে আনার সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশের ভিন্ন ভিন্ন

ভৌগোলিক পরিসরে বাসিন্দাদের খাদ্য আচরণের একটা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যেতে পারে যে পরম্পরাগত খাদ্য আচরণগুলি থেকে একটা বড়ো মাপের জনসংখ্যা এখন সরে এসেছে। এছাড়াও, আধুনিক নগরযাপনে খাবারদাবারের সূচিতে যেমন অনেক দুর্লভ খাদ্যসামগ্রীর আমদানি হয়েছে তেমনি অনেক উপেক্ষিত খাদ্যসামগ্রীর ব্যবহারও আবার ফিরে আসছে।

অল্প বৃষ্টিপাতের এলাকাগুলিতে কৃষি সীমিত ছিল বৃষ্টিনির্ভর চাষবাসে। সাধারণত রবিশস্যের প্রচলনই বেশি ছিল বর্ষার ওপর নির্ভরশীলতা কম থাকত বলে। দেশের মানুষ মূলত একটা অন্নবীজ (সিরিয়্যাল) ও একটা ডাল এর ওপরেই নির্ভর করে দৈনন্দিনকার খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করে। একটা তৈলবীজেরও প্রয়োজন হয় রোজকার রান্নায়। এই উপকরণকটির চাষ সর্বত্রই হয় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, যেখানে চাষের তালিকা বিশাল যা থেকে উপযুক্ত শস্যটিকে বেছে নেওয়া যায়। যব, বাজরা, জওয়ার, অড়হর, সর্ষে, তিল, এগুলি কম জল ও রুক্ষ মাটির ফসল। ধান ও ভুট্টা ফসলের জন্য বেশি জলের প্রয়োজন হলেও এই জল প্রাকৃতিক বর্ষণ থেকেই আসে। ফল বাগানের জন্য জলের চাহিদাও প্রকৃতিগত বর্ষা দিয়েই মেটানো হয়, এখানে আবহাওয়ার প্রশ্নটিও জড়িত। এই ধরনের চাষবাসে আধুনিক কৃষির কিছু জ্ঞান কাজে লাগে— এইভাবেই মহারাষ্ট্রে আঙুরের চাষ, হিমাচল প্রদেশের আপেল চাষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাষের এই আধুনিকতার সরলীকরণ হয়েছে জলের অতিরিক্ত ব্যবস্থায়। সহজসরল ফর্ম্যুলাটি হল জলের ব্যবস্থা থাকলে যে কোনো জায়গাতেই ফসল বাড়ে। এখানে গমচাষের প্রসঙ্গটি আনা যেতে পারে। গমচাষের ক্ষেত্রটি এইভাবেই বেড়ে গেছে সারা দেশেই। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের বিশাল বিশাল চাষজমিতে যেখানে জওয়ার বাজরার উৎপাদন হত সেখানে এখন গমচাষ হয়। শুধু তাই নয় নাতিশুষ্ক (semi-arid) এলাকাগুলিতে— যেমন মহারাষ্ট্র— আখের চাষও এইভাবেই শুরু হয়ে যায়। প্রথমে যখন চাষের এলাকাটি কম থাকে তখন এই সম্ভাবনাটিকে সুস্থ ও উজ্জ্বল মনে হয় কিন্তু পরে ক্রমশ যখন চাষের এলাকাটি বাড়তে থাকে জলের টানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। এই সব অঞ্চলের তুলাচাষের ক্ষেতগুলিতে এখন আখের উৎপাদন হচ্ছে এবং জলের চাহিদা বেড়ে গেছে চার থেকে ছয় গুণ। বৃষ্টির অভাবে বা সেচের জলে টান পড়লে অনেক দুর্বল চাষির জমিতে চাষ হয়না। বুন্দেলখণ্ডের পরম্পরাগত সর্ষেচাষের বদলে গমচাষ হচ্ছে। গমের তুলনায় পরম্পরাগত সর্ষে চাষে এক তৃতীয়াংশ জল লাগে। এই অবস্থা ভারতের আরো অনেক অনেক বেশি অঞ্চলের। গমচাষের প্রকরণে জলের ব্যবহারের যে নির্দেশ তাতে পরম্পরাগত গমচাষের এলাকায় দেশজ উত্তম গুণের গমের বদলে

সংকরায়িত গম অথবা ল্যাবরেটারিতে জন্মানো বীজের গমের উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে ফলন বেশি হওয়ার জন্য। দেশজ গমের চাইতে বেশি উৎপাদনের যে গম তাতে বেশি জলসেচনের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও, এই বেশি জলের গমচাষ নাতিশুষ্ক ও শুষ্ক এই দুই এলাকাতেও চালু করা হয়েছে ভূ-জলের ভরসায়। এই সব অঞ্চলে পরম্পরাগত গমচাষও হত যদিও খুবই সংযতভাবে। এই সব এলাকার পরম্পরাগত অল্প জলের চাষগুলির থেকে সর্বত্রই যখন বেশি জলের টান বেড়ে গেল তখন ভূ-জলের ভান্ডারটিতেও সমানভাবে টান দেখা দিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে এই অধিক জলের গমের তুলনায় পরম্পরাগত সর্ষেচাষে এক তৃতীয়াংশ জল লাগে। গম একটি রবিশস্য, সর্ষেও তাই। সুতরাং সম্পূর্ণ এই জলটি আনতে হয় সেচের উৎসগুলি থেকে। এর কুফলগুলি নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আরও কথা হবে।

খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেচ এর ব্যবস্থা আসায় জমির বাৎসরিক উপযোগ বেড়ে গেল, একটা জমি যেটা পরম্পরাগতভাবে বছরে একবারই ফসল দিত তার ওপরে এখন দুবার, তিনবার বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চারবারও চাষ হচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে কৃষি আচরণে কিছু ব্যাপক দুরাচারও ঢুকে পড়ল। এগুলি এল পরম্পরাকে ছাড়িয়ে আধুনিক চাষবাসে নামার সদিচ্ছায়, এবং অবশ্যই এর পেছনে ছিল একটা নীতিসম্মত সরকারী মদত। ১৯৬০ এবং ৭০ এর দশকে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি অর্থ ও প্রযুক্তি ছাড়াও এক বড়ো মাত্রার জ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা বিতরণ করেছিল আধুনিক কৃষির স্বপক্ষে। উপকরণগুলি ছিল রাসায়নিক সারের ব্যবহার, কীটনাশক ও সেচপ্রণালীকে সক্রিয় করে তোলা। ব্যবস্থাগুলি প্রথম কয়েক বছরে এতখানিই ভালো ফল দিয়েছিল, অর্থাৎ, খাদ্য উৎপাদন এতই বেড়ে গেছিল এই নতুন প্রয়োগগুলির প্রভাবে যে তাদের স্থায়িত্ব নিয়ে কোথাও কোনো সন্দেহ আসে নি। তখন এ কথাও ওঠে নি যে এই সমস্ত তথাকথিত আধুনিক উপকরণগুলির আরও কিছু বৈকল্পিক প্রয়োগ হতে পারত কি না— আরো স্থায়ী, আরো ব্যাপক কৃষির স্বপক্ষে! এই সঙ্গে এ কথাটিও ফেলে দেওয়ার নয় যে কোথাও কোথাও স্থানিক স্তরে কিছু সফল সংশোধনের শুরুয়াত ও হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম দিকের জেলাগুলি নাতিশুষ্ক (semi-arid) হওয়া সত্ত্বেও চাষবাসে অনেক বেশি অগ্রসর। ভূ-জলের সেচ, ট্রাক্টর, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির প্রয়োগে চাষিরা যথেষ্টভাবেই অভ্যস্ত এই অঞ্চলে। ভূ-জলের অতিরিক্ত খরচের কারণে এই বিস্তৃত অঞ্চলের জলাশয়গুলি রবি চাষের পরেই অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসেই শুকিয়ে যায়। গমচাষের ক্ষেত্র বেড়ে যাওয়ার কারণে কম বৃষ্টিপাতের বছরগুলিতে অন্য রবিশস্যগুলিকেও রক্ষা করা সম্ভব হত না।

এই অঞ্চলের প্রধান রবিশস্য ছোলা (ডাল)। রাজ্য সরকারের কৃষিবিজ্ঞানীরা গত দু তিন বছরে বৃষ্টিপাতের দিকে নজর রেখে গম ও ছোলাচাষের জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন উৎপাদনের স্বার্থে। কম বৃষ্টিপাতের বছরগুলিতে গম চাষের এলাকা কমিয়ে ছোলাচাষের এলাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে যদিও জলাশয়গুলির জলাভাবের বিষয়টি যা ছিল তাই আছে কিন্তু বিজ্ঞানীদের জল সম্পর্কিত সংবেদনশীলতা আরো কিছু বাড়ালে জলাশয়গুলিকে এখনো রক্ষা করা যেতে পারে। দেশের চলতি অবস্থা এই যে এখানে উদ্ভাবন হয় না বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে পাওয়া আইডিয়াগুলির অনুকরণ হয়। এই অনুকরণগুলিতে সরকারী সংস্থাগুলি যত আরামবোধ করেন অসরকারী (Non-Governmental) সংস্থাগুলিও ততখানিই উৎসাহ পান নাম কিনবার আগ্রহে। কয়েক বছর আগেও অসরকারী সংস্থাগুলিতে স্থানিক মাত্রার উদ্‌ভাবনের একটা রেশ ছিল। উদ্ভাবন হলে যে কোনো জায়গা বা এলাকার জল মাটির উপযুক্ত চাষের পদ্ধতিগুলির উদ্ভাবন হতে পারত কিন্তু এইভাবে দেশ চলে না এখানে যাপনের স্তর ওপরে তোলার ব্যবস্থাগুলি কী হবে তার নির্ণয় হয় দিল্লি কিংবা রাজ্যের রাজধানীগুলিতে বসে।

কম জলের এলাকাগুলি এ দেশে বিশাল। রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র থেকে দক্ষিণে নেমে এসে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কিছু অংশ, উত্তরের বুন্দেলখণ্ড (উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি জেলা জুড়ে বিস্তৃত এক পাথুরে অঞ্চল), মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি এলাকা, এ ছাড়াও দেশে আরও কিছু শুকনো অঞ্চল রয়েছে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড় ওড়িসা ও পশ্চিমবঙ্গে। এটা একটা মনে রাখার মত কথা যে পুরুলিয়া অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত বছরে ১৪০০ মিলিমিটার ও বাঁকুড়ায় যেখানে এ অঙ্কটি ১৫০০ মিলিমিটার (কলকাতার চাইতেও বেশি), তা সত্ত্বেও এই জায়গাগুলি খরাপ্রবণ কারণ এখানে প্রকৃতিতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থাটি বেশ অপরিসর। প্রকৃতির ব্যবস্থাটি যথেষ্ট না থাকলে মানুষের উদ্ভব করা ব্যবস্থাগুলি অতখানি ক্ষমতাশীল বা ব্যাপক হতে পারে না। বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি দিয়ে অবশ্যই এই অবস্থার উদ্ধার সম্ভব ছিল, সে চেষ্টা হয় নি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজনীতি (১৯৭০ থেকে আজ পর্যন্ত) ও আমলাতন্ত্রের কুপ্রভাবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন— এখানে যদিও সম্ভাবনাগুলি মাপে অনেক বড়ো, যা ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি ও ছত্তিসগড়ের অবস্থাতেও অনেকখানি খাটে— দেশের সর্বত্রই জলের প্রযুক্তিকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে আনা হয়েছে যার মন্দ পরিণতি ব্যাখ্যান করতে আরও অনেক পাতা লাগবে। অবশ্যই, এগুলিকে ক্রমশ এখানে আনা হবে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই।